ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 220-226
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.026

অশরীরী চিন্তা-চেতনায় শীর্ষেন্দুর কিশোর উপন্যাস : ভূত ও মানুষের পারস্পারিকতায় এক স্বতন্ত্র মাত্রা

নমিতা হালদার, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রামপুরহাট, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.11.2024; Accepted: 26.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ghosts have long been a significant part of human culture and society, with varying representations across different communities worldwide. In literature, they appear in numerous forms, often embodying fear and mystery, especially in children's stories. The tradition of ghost stories dates back to ancient times, where ghosts were depicted as eerie and somewhat self-aware beings, often creating terrifying situations in human society. These early ghosts were deeply conscious of their existence, which led them to disturb the living. However, over time, the portrayal of ghosts has evolved, particularly from the mid-20th century, with literature reflecting a shift in how ghosts interact with humans. Instead of being enemies, ghosts began to coexist with humans in a more harmonious manner.

Among the authors who have revolutionized the image of ghosts, turning them from menacing figures to more friendly ones, Shirshendu Mukhopadhyay stands out in Bengali literature. His works brought a fresh perspective to children's literature, breaking the monotony of traditional ghost stories. Mukhopadhyay infused humor into his depiction of ghosts, challenging the conventional frightening portrayal. His approach reflects a broader fascination with ghosts, which blend curiosity and fear in the human imagination. In popular belief, ghosts are the spirits of the dead, often imagined as vengeful or seeking to fulfill unresolved desires, such as the legend of the vengeful woman who becomes a ghost after dying with unfulfilled longing.

Mukhopadhyay, however, dismantled these age-old myths, presenting ghosts not as terrifying enemies, but as beings who fear humans. His transformation of the ghost image is rooted in the works of earlier writers like Upendrakishore, Trailokyanath, and Parashuram, who introduced ghost stories in Bengali literature. Yet, Mukhopadhyay's approach was unique. He combined elements of humor, simplicity, and art to redefine the ghost figure, allowing them to be part of society in a more relatable and engaging manner. This shift in how ghosts are portrayed – as beings who can coexist with humans rather than terrorize them – is the central focus of this analysis.

Keyword: Shirshendu Mukhopadhyay, Ghost, Human, Society, Traditional, Juvenile literature, Terrible.

বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র ভূত। বাংলা সাহিত্যে ভূতের কথা এসেছে নানাভাবে। আশ্চর্যের বিষয় শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, ভূতের কথা এসেছে বিশ্বের প্রায় সব ভাষার সাহিত্যে। বিশেষ করে শিশু-কিশোর সাহিত্য সাম্রাজ্যে ভূত একটি অনিবার্য চরিত্র। বর্তমান সমাজে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এমন অত্যাধুনিক যুগেও এই জাতীয় সাহিত্যের কদর কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। পাঠকরা অনেক বেশি আগ্রহ নিয়ে বরং এই ধরণের লেখার প্রতি দিন দিন আকৃষ্ট হয়েছে। ফলে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে ভৌতিক কাহিনি লেখার প্রবণতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। যেহেতু বর্তমান সময়ের পাঠকরা ভৌতিক কাহিনির প্রতি তীব্র আকর্ষণবোধ করছে সেহেতু দেখা যায়, একরকম ভূতের গল্প-উপন্যাস লিখেই অনেক সাহিত্যিক সাহিত্যজগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছেন। মানুষ ভয় পেতে ভালোবাসে। ভয়ের সঙ্গে মানুষের চিরাচরিত সম্পর্ক। আর মজার বিষয় হল এই যে, সেখানে ভূত যে থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, আসলে ভয়ের পরিবেশটা থাকলেই যথেষ্ট। সেই পরিবেশ মানুষের মনে এমন এক শিহরণ জাগায় যা তাদেরকে আনন্দ দেয়। অবশ্য বিশ শতকের প্রারম্ভে সেই ভৌতিক পরিবেশ ছিল অনেক বেশি ভয়ানক ও গা-ছমছমে। তখনকার ভূতেরা নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ছিল অনেক বেশি সচেতন। তাই তো নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে প্রায়ই মানুষের ওপর চড়াও হত। মানুষের ক্ষতি করে বুঝিয়ে দিত যে তারা ভয়ঙ্কর। তাদের উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। কাজেই সেসময় ভাঙা বাড়ি বা পরিত্যক্ত জায়গাও পরে থাকতে দেখা যেত বিস্তর। বর্তমান সমাজে যা প্রায় দেখায় যায় না। তবে ধীরে ধীরে ভূত সম্পর্কে এমন ভাবনা পালটে যাচ্ছে এবং বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে ভূতেদের এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। তারা মানুষের সামনে আর ভয়ঙ্কর রূপে নয়, বরং বন্ধু রূপে আসতে চাইছে। মানুষের বন্ধু হয়ে মানবসমাজে মিলেমিশে থাকতে চাইছে। এমন বন্ধু ভূতের সার্থক রূপকার হলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তিনি ভূত সম্পর্কে প্রাচীন ধারণাকে এক লহমায় চূর্ণ করে দিয়ে ভূতকে মানব দরদী তথা বন্ধুতে পরিণত করে তোলেন। যদিও এর পূর্ব প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল উপেন্দ্রকিশোর, ত্রৈলোক্যনাথ, পরশুওরাম প্রমুখ লেখকের হাত ধরে। তবে সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় যেভাবে ভূতের পুরোনো ভয়ঙ্কর মিথকে ভেঙে দিয়ে তেনাদেরকে একেবারে মানুষের অত্যন্ত নিকট জন করে তুলেছেন তা সত্যিই অনন্য। অসাধারণ বর্ণণায় ও নিপুণ কৌশলে ভূতকে বাংলা সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন আধুনিক সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যের এই প্রবাদপ্রতিম বরেণ্য লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের সুখিগঞ্জ মহকুমার বাইনখাড়া বা বানিখাড়া গ্রামে, ২রা নভেম্বর ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে। তা ছিল একেবারে বাণভাসি অঞ্চল। লেখকের নিজের ভাষায়,

> "বর্ষাকালে এঘর থেকে ওঘর যেতে নৌকো লাগত।"[১]

পিতা ফণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, মাতা গায়েত্রী দেবী। তাঁরা দুজনেই ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। ফলে বাড়িতে প্রায়ই সাধু-সন্ত, জ্যোতিষী-তান্ত্রিকদের ছিল অবাধ যাতায়ত। তাঁর বাড়ির পরিবেশটা ছিল বেশ পড়ুয়া ধরণের। তাঁর বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা সবাই খুব পড়তেন। আর বাড়িতে অনেক বই থাকার কারণে খুব ছোটোবেলা থেকেই তাঁর পাঠাভ্যাসও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ছোটোদের বই পড়ার ব্যাপারে অনেক পরিবারে নানান রকম বিধিনিষেধ থাকলেও তাঁর পরিবারে কিন্তু তেমন কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। অবশ্য এ ব্যাপারে বাবা-মার উদারতাই তাঁকে দিয়েছে অবাধ স্বাধীনতা। তিনি বাল্যকাল হতেই বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখের লেখা পড়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন সর্বভুক পাঠক। এ বিষয়ে তিনি 'আত্মকথা'য় জানিয়েছেন,

> "আমি ছিলাম আগ্রাসী পাঠক। বিশ্বসাহিত্যের অনেক মণি-মাণিক্যিই আমার ঝুলিতে আছে। আমি ক্লাসিকাল সাহিত্য পড়েছি, পাশাপাশি পড়েছি থ্রিলার। আমার বাবাও একটা সময় খুব থ্রিলার

> পড়তেন। বাবা আমাদের শিলিগুড়ির বাড়িতে প্রচুর থ্রিলার কিনেছিলেন। আমি যখন ছুটিতে শিলিগুড়ি যেতাম তখন এসব বই পড়তাম। মনে আছে বাবা কিনেছিলেন 'The Complete Plays of Bernard Shaw'। কোনো এক ছুটিতে গিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম বার্নাড শ এর সব নাটকগুলো। পড়তে আমার খুব ভালো লাগত।"[২]

কথাসাহিত্যের জগতে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন ছোটোগল্পকার হিসাবে। প্রথম ছোটোগল্প 'জলতরঙ্গ' (১৯৫৯) যখন 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর। সাহিত্য জীবনের একেবারে গোড়ার দিকে কবিতা লেখা শুরু করলেও সাহিত্য জগতে তিনি মূলত কবি হিসাবে পরিচিত হতে পারেননি; পাঠকমহলে তিনি পরিচিত হয়ে আছেন স্বাধীন ভারতের অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় কথাশিল্পী হিসাবে। শীর্ষেন্দু অল্প বয়সে কলম ধরলেও তা কিশোরদের জন্য ছিল না, ছিল বড়দের জন্য। বড়দের সাহিত্য রচনা করে জনপ্রিয় হওয়ার বেশ কিছু বছর পর ছোটোদের সাহিত্যে হাত দেন। তিনি মনে করতেন ছোটোদের জন্য লেখা একেবারেই সহজ ব্যাপার নয়। কারণ ছোটোদের মনের কথা তাদের মনের মতো করে পরিবেশন করতে না পারলে, তা অপাংক্তেও হয়ে যায়। তাই শীর্ষেন্দু কখনও ভাবেনও নি যে তিনি কোনোদিন শিশু-কিশোরদের জন্য লিখবেন। কিন্তু 'আনন্দমেলা'র তৎকালীন সম্পাদক কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অনুরোধেই তিনি ছোটোদের জন্য লেখালেখি শুরু করেন। কবি নীরেন্দ্রনাথের মতে বড়োদের জটিল, মনস্তাত্ত্বিক জীবন-জীজ্ঞাসায় দিন দিন কলমে যে নোংরা জমছে, তা শুদ্ধ করা উচিৎ। একমাত্র ঈশ্বররূপী ছোটোদের জন্য লেখার মধ্য দিয়েই সেই নোংরা পরিষ্কার হতে পারে। এ সম্পর্কে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আত্মকথা'য় বলেছেন,

> ''আমি অরিজিনাল কিশোর সাহিত্যিক নই। শিশু সাহিত্য কখনও রচনা করব বলে ভাবিওনি। আমার মনেও কখনও হয়নি তা পারব বলে। তারপর ১৯৭৫-৭৬ সালে যখন যাদবপুরে থাকি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তখন 'আনন্দমেলা'র সম্পাদক। উনি আমার বাড়িতে এসেছিলেন। খাওয়াদাওয়া করলেন। তারপর আমাকে তিনি হঠাৎ বললেন 'তুই আনন্দমেলার জন্য একটা গল্প দে।' আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভয় পেয়ে বললাম, 'নীরেনদা, আমি কখনো লিখিনি বাচ্চাদের জন্য। আমার মানসিক দিকটাই তৈরি হয় নি বাচ্চাদের জন্য লিখব বলে।' উনি বললেন 'লেখ না একটু চেষ্টা করে।' ওই একটা গল্প লিখলাম 'গন্ধটা খুব সন্দেহজনক'। নীরেনদার ভালো লাগলো। আবার বললেন, 'এবার আর একটা লেখ।' আর তারপরেই বললেন 'উপন্যাস লেখ।' আমি তো আরও ভয় পেয়ে গেলাম। বাচ্চাদের উপন্যাস। গল্প তবু ঠিক আছে, উপন্যাস আমি কি করে লিখব। তারপরে লিখলাম 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। তারপরে দেখেছি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সেই যে শুরু হল আজ অব্দি চলছে; তবে কিশোরদের জন্য লেখালেখি আমার নীরেনদার জন্যই হয়েছিল।''[৩]

অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অল্প বয়স থেকে লেখালেখি শুরু করলেও ছোটোদের জন্য লিখতে শুরু করেন সাহিত্যে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছর কুড়ি পরে। ১৯৭৫-৭৬ সালে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর তাগিদে লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ছোটোদের জন্য লেখার অনুপ্রেরণা অনুভব করেন। কিন্তু ছোটোদের জন্য লিখতে গিয়ে শীর্ষেন্দু প্রথম যে সমস্যায় পড়েন তা হল বিষয়ের অভাব। আমরা আগেই বলেছি যে, শীর্ষেন্দু মনে করতেন, ছোটোদের জন্য রচিত সাহিত্য ছোটোদের মনের মতো না হলে তা অপাংক্তেয় হয়ে যায়। এই কারণে তিনি সাহিত্যজীবনের শুরুর দিকে ছোটোদের রচনায় হাত দেন নি। কিন্তু পরবর্তীতে লিখতে হওয়ায় তিনি নানারকম চিন্তা-ভাবনা করে আকর্ষণীয় সব বিষয়ের অবতারণা করেছেন কিশোর সাহিত্যে। এমনই এক চিন্তা-ভাবনার ফসল স্বরূপ সাহিত্যে জায়গা করে নেয় ভূত-প্রেতেরা। এপ্রসঙ্গে লেখক কৃত্তিবাস পত্রিকায় জানিয়েছেন,

"...আমি কোনো দিন ছোটোদের লেখা লিখব বলে ভাবিনি। জীবনের অন্তত প্রথম কুড়ি বছর ছোটোদের জন্য কিছু লিখিনি। তারপর যখন লিখতে শুরু করলাম, তখন আমার বিষয়ের অভাব হল। কী লিখব ছোটোদের জগৎ নিয়ে? আমি তো সেটা চিনিই না। তখন আমি মাথা থেকে নানা রকম চিন্তা করে ভূতকে আমদানি করলাম। আর মজা করতে আমি ভালোই বাসি। তাই ভূতকে নিয়ে মজা করতে শুরু করলাম। এইভাবে 'গোঁসাইবাগানের ভূত' লেখা হল। এরপর 'গন্ধটা খুব সন্দেহজনক' লেখা হল। এই ভাবে আস্তে আস্তে ভূতটা আমার ব্র্যান্ডের মতো হয়ে গেল। ভয় পাওয়ানো ভূত আমি পছন্দ করি না।"[৪]

সুতরাং, বড়দের সাহিত্যাকাশে সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কিশোরসাহিত্যে নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করেন সত্তরের দশকে। এরপর যত দিন এগিয়েছে ততই তিনি কিশোরসাহিত্যে গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। কিশোরদের মনের মতো করে যে কোনো বিষয় নিয়ে স্বচ্ছ, সুন্দর, স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। তবে বাংলা কিশোর সাহিত্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ পরিচিতি মজাদার ভূতের সার্থক রূপকার হিসেবে। তিনি নিজে ভূতের পাল্লায় পড়েছেন বহুবার। আর সেসব ভূত মোটেই সুবিধার ভূত ছিল না, তারা রীতিমত সব ভয়ঙ্কর ভূত। কিন্তু ছোটোদের জন্য সৃষ্ট ভূতেদের তিনি কখনোই ভয়ঙ্কর করে আঁকতে চান নি। এঁকেছেন মানুষের উপকারী বন্ধু হিসাবে। শীর্ষেন্দুর লেখা এমন এক কিশোর উপন্যাস হল 'গোঁসাইবাগানের ভূত'। যেখানে ভূত ও মানুষের বন্ধুত্বের ছবি স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'গোঁসাইবাগানের ভূত' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। অদ্ভুত এবং ভুতুড়ে কাণ্ডের সমাহারে এক চমকপ্রদ কাহিনি উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। প্রধান চরিত্র বুরুন বার্ষিক পরিক্ষায় অন্যান্য বিষয়ে ভালো নাম্বার পেলেও অঙ্কে তেরো পেয়ে একেবারে বোকা বনে গেছে। ফলস্বরূপ তাই রাগী ডাক্তার বাবা অঙ্ক শিখতে বুরুনকে পাঠায় আড়াই মাইল দূরে করালী মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি কামরাডাঙায়। শুধু তাই নয় এবার থেকে তার নিজের কাজ সব নিজেকেই করতে হবে। এতেও সে তেমন অপমান বোধ করেনি। কিন্তু পোষা পাখির মুখে তার অঙ্কে তেরো পাওয়ার শ্লোগান শুনে সে সত্যিই প্রচণ্ড রেগে যায়। তারপর একসময় কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা গোঁসাই ডাকাতের বাগানে এসে ঢুকে পড়ে। সেখানে পরিচয় হয় নিধিরাম ভূতের সঙ্গে। বুরুন দেখে নিধিরাম জলের উপর কেমন সুন্দর পা ফেলে দিব্যি হেঁটে চলে এল। সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা মোটেই সম্ভব নয়। হয় দেবতা, নয় অপদেবতা দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা শক্তির গুণেই এমন কর্ম সম্ভব। তাই বুরুনের পক্ষে ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বুরুনের মনটা এতই খারাপ যে আর কোনো কিছুকেই সে ভয় পাচ্ছে না। এদিকে নিধিরামও বুরুনকে ভয় পাওয়ানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কখনও জলের উপর হাঁটছে তো কখনও নিজের মুণ্ডুটাকে টুপির মতো খুলে নিয়ে আবার যথাস্থানে লাগিয়ে রাখে। বুরুনকে ভয় খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে বলে,

"মাথায় খুব উকুন হয়েছে কিনা তাই চুলকোচ্ছে।"[৫]

বুরুন এতেও ভয় না পেয়ে শুধু 'ও।' বলে প্রসঙ্গটাকে শেষ করে দেয়। নিধিরাম তাতে বেজায় চটে যায়, চোখের সামনে ভূত দেখেও যে এমন নির্বিকার ভাবে কুল খেতে পারে তা নিধিরামের জানা ছিল না। সে বুরুনকে জানায় এটা ইয়ার্কি নয়, ম্যাজিকও নয়। সে এই জঙ্গলের দুশো বছরের পুরোনো ভূত। তাতেও বুরুন ভয় না পাওয়ায় নিধিরাম মরিয়া হয়ে তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টায় নিজের ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতটা খুলে নিয়ে চারিদিকে তলোয়ারের মতো ঘোরাতে লাগল, একইরকম ভাবে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত খুলে নেয়। দুটো পা দুহাতে খুলে নিয়ে দেখায়। একবার অদৃশ্য হয়ে ফের হাজির হয়ে দেখাল। কখনও তেরো-চোদ্দো ফুট লম্বা তো কখনও আবার হোমিওপ্যাথির শিশির মতো ছোট্ট হয়েও বুরুনকে ভয় দেখানোর চেষ্টা

করে। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও বুরুনকে ভয় দেখাতে না পেরে শেষে অসহায়ভাবে ছলছল চোখে বুরুনের দিকে চেয়ে থাকে।

মানুষের সমাজের মতো ভূতেদেরও সমাজ আছে। তাতে মানুষদের মতোই আছে আচার-বিচার, নিয়ম, রীতি, নীতি। ভূতকে সর্বদাই মানুষ ভয় পায়। সেই হিসাবে ভূতেদেরও নিজেদের সমাজে মান-মর্যাদা আছে। উঁচু, নীচু শ্রেণি বিভাজন আছে। তাই ভূত হওয়া সত্ত্বেও নিধিরামকে বুরুন ভয় না পাওয়ায় নিধিরাম কাঁদো কাঁদো স্বরে বুরুনকে বলে,

> "তুমি আমাকে বড় মুশকিলে ফেললে দেখছি। এখন নিজেদের সমাজে আমি মুখ দেখাব কেমন করে বলো তো! গোঁসাই সর্দার শুনলে আমার গর্দান যাবে।"[৬]

শুধু তাই নয়, এর জন্য নিধিরামকে গোঁসাইবাবা তার বর্তমান পোস্টের থেকে নীচু পোস্টে নামিয়ে দেবে এবং তার মাথা কেড়ে রেখে দেবে। তখন ভূত সমাজের কেউ আর নিধিরামকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে না। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই নিধিরামকে অন্য ভূতেরা দুয়ো দিতে থাকে। অপমানে, দুঃখে নিধিরামের চোখ ফেটে জল আসে। কিন্তু তাও চেষ্টা করতে ছাড়ে না। সর্বদা বুরুনের উপকার করে। নিজে সবসময় বুরুনের সঙ্গে থাকতে না পেরে সে তার অনুচরদের বুরুনের আশে পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। তাদের তথা নতুন ভূত, আনাড়ি ভূত, ভিতু ভূত, গাড়োল ভূত, পাগল ভূত, সাধু ভূত, চোর ভূত প্রত্যেককে বলা আছে যে বুরুন ডাকলেই যেন তক্ষুনি তাকে খরব দেওয়া হয়। ভূত হয়েও সর্বদা ভয়ে তটস্থ হয়ে থেকেছে নিধিরাম। শুধুমাত্র বুরুনকে ভয় খাওয়ানোর জন্য। এছাড়াও এ উপন্যাসে পাই খোনাসুরকে। সেও বুরুনের বন্ধু। বেশ মজার ভূত এই খোনাসুর। হাবু যে বশীকরণ মন্ত্র দিয়ে বুরুন ও ভুতুমকে আটকে রেখেছে সেকথা বুরুনের দাদু রামকবিরাজকে প্রথম জানাই ওই খোনাসুরই। আর জানাতে এসে কবিরাজ মশাইয়ের কাছে নিজের গা-গতরের ব্যথার খানিকটা ওষুধও নিয়ে যায়। হাবুর নামে গাল-মন্দ করে যায় রামকবিরাজের কাছে। এ যেন আমাদের সমাজের আর পাঁচটা সাধারণ মানুষেরই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে খোনাসুরের মধ্য দিয়ে।

উপন্যাসটি নিয়ে সিনেমা করেন পরিচালক নীতিশ রায় ও প্রযোজক মৌসুমী রায়চৌধুরী। ২০১১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর একই নামে ছবিটি মুক্তিলাভ করে।

এমন ভালোমানুষ আর মজাদার সব ভূতের ছবি শীর্ষেন্দুর অন্যান্য ভৌতিক কিশোর উপন্যাসগুলিতেও আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেখানে ভূত ও মানুষের সম্পর্ক নিবিড়ভাবে ধরা পড়েছে। এখানে আরও একটি বিষয় ধরা পড়েছে যথা, ভূতকে মানুষ নয় বরং মানুষকেই ভূত ভয় করেছে। এমন সব মজাদার ভূত হল 'হেতমগড়ের গুপ্তধন' উপন্যাসের নন্দকিশোর মুন্সীর ভূত, 'ঝিলের ধারে বাড়ি' উপন্যাসের কুলদা চক্রবর্তীর ভূত, 'বিপিনবাবুর বিপদ' উপন্যাসের পীতাম্বরের ভূত, সে তো নিজে ভূত হয়েও আরেক ভূতের ভয়ে মরিয়া; 'টুপি' উপন্যাসের ঝিকু বিশ্বাসের ভূত ইত্যাদি। 'হেতমগড়ের গুপ্তধন' উপন্যাসে নন্দকিশোর মুনসির ভূত জানায় যে, ছেলেবেলায় কত সে ভূতের ক্ষমতার গল্প শুনেছিল; ভূতেরা নাকি লম্বা হাত বাড়িয়ে বাগান থেকে লেবু ছিঁড়ে আনতে পারে, তারা নাকি মাছভাজা খায়, মানুষের ঘাড় মটকায়। কিন্তু নন্দকিশোর নিজে ভূত হওয়ার পর জানতে পেরেছে এসবই মিথ্যে কথা। অর্থাৎ ভূতের কানাকড়ি ক্ষমতাও নেই। এইভাবেই লেখক ভূত সম্পর্কে বহু প্রচলিত মিথ্যে ধারণাকে বিশেষ করে ভূতের ভয়ঙ্কর রূপকে বিসর্জন দিয়ে তাদের সহজ-সরল রূপকে এনে পাঠকের ভয় ভাঙতে চেয়েছেন। ভূতের কোনো অতিরিক্ত ক্ষমতা নেই; একথায় লেখক ছোট্ট ছোট্ট পাঠকদের মন থেকে যেমন ভূতের ভয়কে চিরতরে ভেঙে দিয়েছেন তেমনি আবার ভূতেরদেরও দুঃখের দিকটি দেখাতেও ভোলেননি। তাই তো নন্দকিশোর মুন্সীর ভূত বহু আক্ষেপ করে মাধবকে জানিয়েছে,

> "দূর দূর! ডাহা মিথ্যে। ভূত হওয়ার পর আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি ভূতেদের কানাকড়ি ক্ষমতা নেই। বাতাসের মতো ফিনফিনে শরীর নিয়ে কিছু করা যায় মশাই? আপনিই বলুন!"[৭]

অর্থাৎ লেখক ছলে, বলে, কৌশলে বুঝিয়ে দেন যে ভূতকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের রচনায় ভূত হয়ে উঠেছে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো। যারা সুখ-দুঃখে সবসময় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কখনও বা নিজেদের সমস্যা নিয়ে হাজির হয়েছে মানুষের কাছে। তবে লেখক ভূতকে সাহিত্যে এমন ভাবে উপস্থাপন করলেও নিজের কিন্তু ছিল খুব ভূতের ভয়। তিনি স্বচক্ষে ভূত দেখেও ছিলেন। সেসব ভূত সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর। তিনি তাঁর ভূত দেখার অভিজ্ঞতা স্বীকার করে জানিয়েছেন,

> "কাটিহারেই ঘটেছিল অবিস্মরণীয় সেই ঘটনা। নিশুতি রাতে একদিন আমার ঘুম ভেঙে গেল। আর শুনলাম মেমসাহেবের হাই হিলের শব্দ, পিছনের বাগান দিয়ে হেঁটে এসে আমাদের ডাইনিং হলে ঢুকে ডাইনিং টেবিলের চারপাশে কয়েকবার চক্কর দিয়ে ফের ফিরে চলে গেল। কি ভয় যে পেয়েছিলাম তা বলার নয়। তারপর থেকে কিছুদিন বাদে বাদেই ওই একই ঘটনা। আর এই ঘটনা পরবর্তী পাঁচ-ছয় বছর ধরে ঘটে চলল। যার ব্যাখ্যা আমার বুদ্ধির অতীত।"[৮]

লেখকের এমন ভূতের ভয় থাকা সত্ত্বেও নিজ সাহিত্যে ভূতকে অমন মজাদার করে উপস্থাপন করার অন্যতম কারণ হল, শিশু-কিশোরদের মন থেকে ভূতের ভয়কে চিরতরে বিনাশ করা। আসলে তিনি নিজে ভূতকে যেভাবে চিনেছেন, ছোটো পাঠকদের তেমনভাবে চেনাতে চাননি। ভূতকে তাদের বন্ধুরূপে দেখিয়েছেন। ভূতকে এমন মানবিক করে উপস্থাপন করার কারণ হিসাবে এক পত্রিকায় তিনি জানান,

> "ভয় দেখানো ভূতকে নিয়ে লিখতে ইচ্ছে হল না। ভূত আমার কাছে সুপারহিরো চরিত্র। সাধারণ মানুষ যা করতে পারে না, ভূত তাই করে। ভূত মজাও করে। বাচ্চারা এটা পছন্দ করছে খুব।"[৯]

ভূতের ভয়ের যে ক্ষতিকর প্রভাব লেখকের জীবনে পড়েছিল তা ছোটদের উপরেও পড়ুক এটা কখনই চান নি। তাই লেখার ক্ষেত্রে নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে তেনাদেরকে একেবারে মানবিক করে গড়ে তুলেছেন। কখনো রাজাগজা তো কখনও আবার ভোলাভালা করে উপস্থাপন করেছেন। যারা বেশিরভাগ সময় মানুষের উপকার করেছে। যেমন 'ছায়াময়' উপন্যাসে দেখি ছায়াময় ওরফে চন্দ্রকুমারের ভূত সাহায্য করেছে ইন্দ্রজিৎপ্রতাপকে। মানব সমাজের অনুসারী যে ভূত সমাজ, তা শীর্ষেন্দুর অনেক লেখাতেই উঠে এসেছে। যেমন ধরা পড়েছে তাঁর 'ঝিলের ধারে বাড়ি' উপন্যাসেরর ভূত কুলদা চক্রবর্তীর মধ্যে। কুলদা চক্রবর্তী জীবিত অবস্থায় চতুর্ভুজের মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। সেই অবস্থায় মন্দিরে নরবলি দিতে যাওয়ার অপরাধে নবীনের ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠপুরুষ কালীচরণ তাকে মন্দির থেকে বের করে দেন। তারপর থেকে একদিনও তিনি ওই মন্দিরে ঢুকতে পারেননি। কিন্তু ভূত হওয়ার পরেও তিনি চতুর্ভুজের মন্দিরের পুরোহিতের পদ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। আসলে ভূত লেখকের কাছে মৃত্যু পরবর্তী ক্ষমতাশালী মায়াবী চরিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই তেনাদের ভয় নয় বরং বন্ধু ভাবতে শিখিয়েছেন পাঠকদের। ভূত ও মানুষ হয়ে উঠেছে যেন একে অপরের পরিপূরক।

উপসংহারে বলা যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সৃষ্ট সমস্ত ভূত উপকারী মানববন্ধু। তারা মানুষদের বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে না। বরং বিপদে আপদে তেনারা মানুষদের সহায়তা ও সাহচর্য দান করে থাকে। ভূতেদের এমন ভাবে চিত্রিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় চেয়েছেন যে কিশোর কিশোরীরা ভৌতিক গল্প উপন্যাসের রহস্য-রোমাঞ্চকর, শিহরণ জাগানো নির্ভেজাল মজা উপভোগ করুক। আসলে ভূতের ভয়াল, ভয়ঙ্কর রূপ অপরিণত শিশু-কিশোরদের মনে যাতে স্থায়ীভাবে না বাসা বাঁধে তার জন্যই তিনি ভূতকে মজাদার করে তুলেছেন। কারণ ভয়ের জন্য তাদের শুধু

সারাজীবন ভীরু অপবাদই সইতে হবে এমন নয়, সেইসঙ্গে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশেও বিঘ্ন ঘটবে। তাই ভয় পাওয়ানো ভূতকে তিনি একেবারেই বিসর্জন দিয়ে সাহিত্যে মজাদার ভূতেদের আমদানি করেছেন। ভূত সম্পর্কে আদিকাল থেকে সমাজে প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে এক লহমায় ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করেছেন শীর্ষেন্দু। অশুভ শক্তিকে শুভ শক্তিতে পরিণত করে সামাজিক বদল ঘটাতে চেয়েছেন লেখক। মানুষের সংস্কারের চাকাকে উলটো পথে ঘুরিয়ে বিশ্বাসের বদল ঘটিয়েছেন তিনি। এখানেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভৌতিক গল্প উপন্যাসের অনন্যতা।

তথ্যসূত্র:

১. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আত্মকথা, আমার জীবনকথা, অশোকগাথা পাবলিকেশন, কলকাতা বইমেলা, ২০১৯, ভূমিকা অংশ।
২. তদেব, পৃ-৬১
৩. তদেব, পৃ-৪৬।
৪. বীজেশ সাহা, সম্পাদিত, কৃত্তিবাস, একটা গোল অথবা চৌকো টেবিলের আড্ডা, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ২০২২, পৃ-২৫
৫. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কিশোর উপন্যাস সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৯, পৃ-১০৭
৬. তদেব, পৃ-১০৮
৭. তদেব, পৃ-১৮৮
৮. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আত্মকথা, আমার জীবনকথা, অশোকগাথা পাবলিকেশন, কলকাতা বইমেলা, ২০১৯, ভূমিকা অংশ।
৯. বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন, ২০০৮, পৃ-১২৭-১২৮

গ্রন্থঋণ:

১. আসরফী খাতুন, সম্পাদিত, বাংলা শিশুসাহিত্য: সেকাল ও একাল, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জুন ২০১৯
২. প্রবীর প্রামাণিক, সম্পাদিত বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্য আধুনিক বিচার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, বইমেলা, ২০১০
৩. মহুয়া ভট্টাচার্য গোস্বামী, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদিত, সবুজপাতা-২, শিশুকিশোর অকাদেমি, দ্বিতীয় শিশুকিশোর উৎসব, ২০১০
৪. ড. মহুয়া ভট্টাচার্য গোস্বামী, বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ইতিহাস ও বিবর্তন (১৯৫০-২০০০) পত্রলেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১১

পত্র-পত্রিকা:

১. অশোকনগর পত্রিকা, অভিষেক চক্রবর্তী, সম্পাদিত, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, দশম বর্ষ, নবম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৫।
২. লালপরি নীলপরি, আসরফী খাতুন, সম্পাদিত, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শিশুসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, ২০২০।